জেন্ডার, স্পেস, ক্ষমতা ও স্থাপত্যবিষয়ক চিন্তা : কেমন হতে পারে একটি অলিঙ্গবাদী শহর?

সুপ্রভা জুঁই

সময়ের সাথে সাথে আমাদের জীবনযাপনের পদ্ধতিও পালটে যাচ্ছে। বিশেষ করে, শহর জীবনে সেই পালটে যাওয়ার গতিটা অত্যন্ত দ্রুত ও লক্ষণীয়। অথচ সেখানে আমাদের আবাসন কিন্তু একইরকম রয়ে গেছে। আধুনিক স্থাপত্যের পর্যায়ক্রমিক অগ্রগতি নিশ্চয়ই হচ্ছে, কিন্তু স্পেসের চিন্তায় লৈঙ্গিক বিবেচনা কতটা গুরুত্ব পাচ্ছে না পাচ্ছে তা আড়ালেই থেকে যাচ্ছে। শিল্পকলায় লৈঙ্গিক বিবেচনার গুরুত্বকে অবজ্ঞা করা যায় না। নিশ্চিতরূপেই লিঙ্গবৈষম্যকে ছাপিয়ে চিন্তাভাবনা করলেই তাকে সেরা শিল্প বলে ধরা হয়। কিন্তু আমি ব্যক্তি হিসেবে নিজের লিঙ্গপরিচয়জনিত লজ্জা থেকে মুক্ত, আনন্দের সাথে এটা স্বীকার করে নিয়েই এর পরের ধাপে পা রাখতে চাই। অর্থাৎ, আমি নারী এবং এর পরে সেই পরিবেশের সৃষ্টি করা, যা আমাকে ওই পরম মানুষে রূপান্তরিত করতে পারে। এ ক্ষেত্রে স্থপতি এন গ্রিসওল্ড টিং-এর একটি কথা আমাকে ভীষণ ভাবায় :

'আজকের দিনে, স্থাপত্যে একজন নারী হিসেবে সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকতা হলো তার সৃষ্টিশীল সম্ভাবনাকে জাগ্রত করা এবং এজন্য তার মানসিক চিন্তা-চেতনা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কোনোরকমের অপরাধিতা, অক্ষমতা, নৈতিক অবস্থানের বেড়াজাল কাটিয়ে নিজের চিন্তাকে ধারণ করার জন্য সৃষ্টিশীল পদ্ধতি জানার পাশাপাশি মাসকুলিন ও ফেমিনিন-এর মূলতত্ত্ব বোঝা দরকার যে, এগুলো ঠিক কী করে নারী-পুরুষ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিশীলতাকে প্রভাবিত করছে।'

শুরুতেই বললাম দ্রুত সময়ের সাথে পালটে যাওয়ার ঘটনাটা। সেখানে নারীদের সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিরাট পরিবর্তন এলেও সেটার ভিত্তিতে আবাসন ও নগর নকশার প্রথাগত চিন্তাকাঠামোয় কোনো পরিবর্তন আসে নি। নারী সম্প্রদায় এখনো ঘরের কোণে রয়েছেন, এরকমই একটি চিন্তা বহন করে এইসব অবকাঠামো। মনে তাই প্রশ্ন জাগে, নারীর শারীরিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থানের সাপেক্ষে তার প্রতিবেশের সাথে একটা যুতসই সংযোগ স্থাপন করলে সেই শহরটা দেখতে কেমন হবে!

পুরুষপ্রধান একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগে যেখানে ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তিতে উন্নয়ন এবং প্রচুর পরিমাণে ব্যক্তিগত বাহনের ব্যবহার হয়, যাতে করে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ শক্তিক্ষয় হচ্ছে, সেখানে নকশাজনিত সিদ্ধান্তগ্রহণে 'গৃহে নারীর স্থান' বলে ঘটনাটিকে প্রতিষ্ঠিত করা পাশ্চাত্যে শুরু হলেও এখানে এখনো খুব জোরালো নয়।

একাকী কর্মজীবী কিংবা পরিবারে রয়েছেন এমন কর্মজীবী নারী ঘর ছেড়ে বাইরে এসে সারাদিন বা রাত ধরে পরিশ্রম করছেন, অর্থ উপার্জন করছেন, এই বাস্তবতাকে মেনে তাকে আরো উচ্চতর অবস্থায়

নিয়ে আসতে হবে। সেরূপ আবাসন, নগরচিন্তা এবং প্রতিবেশ গঠনের ভাবনায় নতুন উদাহরণ সৃষ্টি করে সেই মোতাবেক মানব বসতি গড়ে তুলতে হবে, যা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা ভেঙে দিতে পারে নিমেষেই। কর্মজীবী নারী এবং তার পরিবারের কথা ভেবে যে সমস্ত আবাসন আমাদের এখানে ইতোমধ্যে রয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো যা ভাবা হচ্ছে, সবখানেই কিন্তু এই চিন্তা-দর্শনের প্রভাব থাকা ভীষণ জরুরি। কারণ 'গৃহ'ই হলো ব্যক্তি মানুষের কর্মের ও চিন্তার উন্নয়নের সর্বোত্তম স্থান। ঘুমের পরেই কাঙ্ক্ষিত জাগরণ সম্ভব। নিজ গৃহকে তাই সারাইখানা বলবারও চল আছে দেখা যায়। পাশ্চাত্যে স্লোগান রয়েছে—

`Good homes make contented workers.'

`Happy workers invariably mean bigger profits, while unhappy workers are never a good investment.'

নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মূল ভিত্তি হলো 'থাকার জায়গা' এবং 'কাজের জায়গা'-র পৃথকীকরণ। তাই বলে শহর এবং উপ-শহর (শহরতলী) জাতীয় গোলমেলে ঘটনা এখানে খাটালে চলবে না। কারণ এখান থেকেই অনৈতিক শ্রেণিবিভাজন শুরু হয়ে যাচ্ছে। যোগাযোগ এবং অন্যান্য সুবিধার মান কমে যাচ্ছে। আবাসন, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক নীতিকাঠামোর জায়গায় রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত দুর্বল বলেই বস্তির মতন অস্বাস্থ্যকর এবং অনিরাপদ জায়গার উৎপত্তি।

অর্থ উপার্জনের দিক থেকে পুরুষপ্রধান ভাবধারা বহাল থাকায় গৃহের মধ্যে পুরুষ গৃহের মালিক এবং নারী গৃহব্যবস্থাপক— এই দুটি আলাদা চরিত্র বহন করে। সারাদিনের ধকল সয়ে ঘরে প্রবেশের পর স্ত্রীর কাছ থেকে সেবা পাবেন পুরুষ, এটাই তখন বাস্তবতা হয়ে ওঠে। উপ-শহরের সমস্ত ঘরবাড়ি লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজনের এক যথাযথ মঞ্চ। কারণ পুরুষের জন্য এ হলো তার উপার্জনের সম্মানস্বরূপ একটি ত্রিমাত্রিক নিদর্শন এবং উপার্জন করছেন না যিনি, অর্থাৎ তার স্ত্রীর জন্য এটা একটা ধারক মাত্র। 'ঘর' তখন আর ঘর না হয়ে কোনো ক্ষমতাধরের দুর্গে পরিণত হয়।

পুঁজিবাদী যুগে একজন সংবেদনশীল মানুষ সচেতন ভোক্তার মতো আচরণ করে থাকেন। সেই প্রেক্ষিতে বাজারটা একবার খেয়াল করলে দেখা যাবে, বাড়িঘর বানানোর সময় বাজার আপনার সামনে কী কী গৃহস্থালির জিনিসপত্র নিয়ে হাজির হচ্ছে। বহুকাল আগে থেকে আমেরিকার মার্কেটিং ম্যানেজারদের বলা হয়েছে আমেরিকান নারীদের কী করে সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত করা যায় তা নিয়ে ভাবতে। সত্তর দশকের বিখ্যাত আমেরিকান বিজ্ঞাপনী সংলাপ ছিল 'I'll Buy that Dream' এবং এখনো সেই স্বপ্নেরই কেনাবেচা চলছে। এই স্বপ্নের বাড়ি করার সময় কতভাবে শক্তিক্ষয় করা হয়, সেদিকটা কি আমরা লক্ষ করি? এত এত শক্তিক্ষয় না করে বাড়িটিরও প্রাণ আছে ভেবে তাকে শ্বাস নেওয়ার মতন করে গড়ে তুললে সেও আমাদের ভালো রাখবে সন্দেহ নেই; এবং তাতে করে প্রতিবেশও বিঘ্নিত হবে না। শক্তির যত অপব্যবহার, কর্মজীবী নারীর সাংসারিক কাজে অর্থ প্রদানের প্রশ্নও ততই বাড়ে। স্বপ্নের বাড়ি খরিদ করতে যেয়ে শেষমেশ অনেক খোয়াতে হয়। কারণ নারী-পুরুষে আয় ও ব্যয়ের অসমতা যত্নে গড়েপিটে তোলা পরিবেশেও বহাল থেকে যাচ্ছে।

একটি গতানুগতিক বাড়ি একজন বিবাহিত কর্মজীবী নারীর জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে একটু লক্ষ করা যাক। সেটা উপ-শহরে হোক কিংবা গ্রামে, আধুনিক স্থাপত্যের নকশায় হোক কিংবা সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে, স্পেস বিভাজন এবং সজ্জার পদ্ধতিটা কিন্তু মোটামুটি একইরকম— রান্নাঘর, খাবার ঘর, বসার ঘর, শোবার ঘর, গ্যারেজ ইত্যাদি। তো এই স্পেসগুলোর চাহিদা হলো কাউকে ব্যক্তিগতভাবে রান্না করা, পরিষ্কার করা, বাচ্চা লালনপালন, ইত্যাদির দায়িত্ব নিতে হবে। আর বাচ্চা বা বয়স্ক কেউ থাকলে আলাদা করে তাদের যাতায়াতের দেখভালও করতে হবে। কারণ আবাসিক বিন্যাসের চর্চাটা কমিউনিটি স্পেস থেকে একেবারে সরে এসে করতে হয়। কোনো প্রকার বাণিজ্যিক বা এলাকাভিত্তিক শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রের সুবিধে নেই, এমনকি ধোপাখানা বা লন্ড্রিও না। এক্ষেত্রে আইনের প্রভাবও রয়েছে নানাভাবে। এই ধরুন সকলের জন্য কিছু কমন স্পেস তৈরি করতে গেলে কর্তৃপক্ষের নজর তো থাকবেই।

একটি গৃহের অভ্যন্তরীণ কাজের সংস্কৃতি কর্মজীবী নারীর বিপক্ষে কাজ করে। কারণ গৃহ মূলত নানারকম পণ্যসামগ্রীতে ঠাসা একটি স্থান। তার মধ্যে কোনোটা কেবল একটি উদ্দেশ্যে, কোনোটা নানা উদ্দেশ্যে, কোনোটা একেবারে অযথা, কোনোটা আবার শক্তিক্ষয় করার মতন মেশিন এবং এগুলো ঘরের যেখানে যেভাবে থাকে তা পরিবারের বাকি সদস্য ও ওই নারীর মধ্যে একটা দেওয়াল তুলে দেয়। কারণ বাড়ির ভিতরে এই প্রোগ্রামগুলোর বিভাজনটাই এমন।

পারিবারিক নির্যাতন বা গৃহসহিংসতার ঘটনা বেশি ঘটে থাকে রান্নাঘর এবং শোবার ঘরে। একটি বাড়ির সমস্ত প্রোগ্রামের যে বিভাজন এবং সজ্জাপ্রক্রিয়া তাতে কোনো বেতন ছাড়া গৃহশ্রমের ভিত্তিতে যে পৃথকীকরণ করা হয়, তার প্রভাব পারিবারিক নির্যাতনে কতটা পড়ে আমরা কেবল আন্দাজ করতে পারি। আশঙ্কা আর নির্যাতনবিহীন একটি রান্নাঘর, শোবার ঘর কি আদৌ বানানো সম্ভব? ডমেস্টিক ফেমিনিস্ট দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী গৃহে থাকা নারী হবেন গৃহ পরিচালনার নেতা। এই ভাবনা থেকেও সরে গিয়ে এখন এসেছে ম্যাটেরিয়েল ফেমিনিস্ট চিন্তা।

যাদের তিনটি মূলভাব হলো :

- তারা গতানুগতিক পুরুষপ্রধান পরিবার প্রথাকে চ্যালেঞ্জ করে;
- তারা নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে কাজ করে। কেবল উপার্জনে সক্ষম একজনের মতো করে নয়, যেমন সমাজতান্ত্রিকরা ভেবে থাকেন। সামাজিক পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় তারা নিজেদের শ্রমকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান। সেটা হতে পারে গৃহিণী, ভৃত্য, একাকী নারী অথবা আরো নানা নতুন শ্রেণির কাজের মধ্য দিয়ে;
- তারা ভবন নির্মিত পরিবেশের পুনর্গঠন করতে চান, যাতে করে পারিবারিক এবং সামাজিক পুনরুৎপাদনে একটা ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়।

নির্যাতনের শিকার কিংবা তালাকপ্রাপ্ত নারীরা এ শহরে হন্যে হয়ে শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র ও নিজেদের জন্য যথাযথ আবাসস্থান খুঁজে মরছেন। আমাদের রাষ্ট্র কি তবে আমাদের মৌলিক চাহিদা পাঠে ব্যর্থ নয়?

আমি কোনো আকাশকুসুম ভাবনার কথা বলছি না। এসবের অনেক কিছুই কিছু কিছু দেশে আদায় করে নিয়েছেন উন্নত চিন্তার নারীরা। এই বিষয়ে এদেশেও গুঞ্জন শুরু হয়েছে। আমার বিশ্বাস তা জোরালো হলো বলে। আবাসননীতিতে রাষ্ট্র মনোযোগী হলে তাতে রাষ্ট্রেরই সুফল। একজন কর্মক্ষম নারী ঘরে বসে বাচ্চা পালছেন রাষ্ট্রের সেবা ছেড়ে, সেখানে রাষ্ট্র এই বাচ্চার দায়িত্ব নেবে না তো কে নেবে! রাষ্ট্র তার স্বার্থ দেখলে এর চেয়ে ভালো বুদ্ধি আর হয় না।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, যতক্ষণ না সমাজের সার্বিক অর্থনৈতিক চিন্তাকাঠামোর পরিবর্তন হচ্ছে, নারী তার অবস্থা উন্নত করতে পারবে না। যতক্ষণ না গৃহস্থালি দায়িত্বের যথাযথ বণ্টন হচ্ছে, নারী তার সমুদয় কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারবে না। ফলে নারীর এই অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে এমন সমাধান প্রয়োজন, যা গৃহস্থালি এবং বাজারনীতির চিরাচরিত বিভাজনকে ঘুচিয়ে দেয়, যা আবাসনের সাথে কর্মস্থানের বিভাজনকেও ঘুচিয়ে দেয়।

কাউকে না কাউকে তো এই পরিবর্তন করতে হবে। এমন অর্থনৈতিক নীতির প্রবর্তন করতে হবে, যাতে বেতনবিহীন অত্যন্ত দরকারি গৃহকর্ম স্বীকৃতি পায়, একইসাথে যেন কর্মজীবী নারীর জন্য গৃহস্থালি অবস্থারও রূপান্তর ঘটে। আগের সমস্ত চিন্তা বাদ দিয়ে স্থপতি এবং নগর পরিকল্পনা করেন যাঁরা, তাঁরা যদি কর্মজীবী নারীদের কথা ভেবে কাজ করেন, তবে কেমন হবে সেই অলিঙ্গবাদী বাড়ি, সেই অলিঙ্গবাদী শহর, সেই অলিঙ্গবাদী প্রতিবেশ!

কিছু কিছু রাষ্ট্র কর্মজীবী নারীদের সমস্যা আমলে নিয়ে কাজ করছে। কিউবার ১৯৭৪ সালের ফ্যামিলি কোড বলছে, পুরুষদেরও নারীর পাশাপাশি ঘরের আধা কাজ এবং সন্তানের দেখভাল করতে হবে সমানভাবে। ফলে রান্নাঘর তখন কিন্তু আর আলাদা রইল না, এটাও হলো সকলের জায়গা। আবাসন প্রকল্পে শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র এবং লন্ড্রি ও রান্নার সুবিধা এখন অপরিহার্য। একইসাথে বয়স্ক এবং শারীরিক নানা সমস্যায় থাকা মানুষদের কথা ভেবেও একটি আবাসন প্রকল্পে নানা সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। তা ছাড়া, ব্যক্তি সীমানা ছাড়িয়ে একই এলাকার সকলে মিলে সকলের খাতিরে কিছু করার মতন স্পেসের কথাও ভাবা উচিত, যা গণতান্ত্রিক শক্তিকে আরো সংঘবদ্ধ করতে সক্ষম।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে আমেরিকায় নারীবাদী, স্থপতি, গার্হস্থ্যবিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় সকলের জন্য এরকম কমিউনিটি সার্ভিস তাঁরা আদায় করে নিতে পেরেছিলেন। এটি সত্যিই সম্ভব। ১৯২০ সাল থেকে পাশ্চাত্যে নারীবাদীরা এই সমস্যার হাল করতে পারছিলেন না। অর্থাৎ সমস্যা তাঁরা ঠিকই বুঝেছিলেন কিন্তু সমাধানের কোনো উপায় পাচ্ছিলেন না। আমরাও আমাদের দেশে এরকম সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি এবং সুখের কথা সমাধান কী হতে পারে তা ভাবতে আমাদের সময় নষ্ট হচ্ছে না। কথা হলো, আমরা কি সেই সমাধানটা নিতে চাই? ব্যক্তি নারীর পছন্দসীমা বাড়িয়ে তাঁর স্বাধীনতা নিশ্চিত করে ঘর, সংসার, সন্তান এবং পরিবারের সাথে অথবা একেবারে একাকী নিজের মতন সেই 'নিজের ঘর', তা কি আমরা চাই?

পাশ্চাত্যের আবাসন প্রকল্পে এরকম একটি কর্মপদ্ধতি প্রচলিত আছে, যেখানে :

১. একটি এলাকার বসতবাড়ির সকল নারী-পুরুষ যাঁরা অর্থ উপার্জন করছেন না তাঁরা একত্রিত হবেন, বাড়িঘরের দেখভাল এবং শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রে কাজ করবেন;
২. নারী-পুরুষ সকলেই সমান সম্মানী এবং কাজের সুযোগ পাবেন;
৩. শ্রেণি, সম্প্রদায় এবং বয়সের ভিত্তিতে পৃথকীকরণের বিলুপ্তি সাধনে সচেষ্ট হবেন;
৪. বেতন ছাড়া ঘরের কাজ করছেন যে সকল নারী তাঁদের প্রতি অবিচার বন্ধে সোচ্চার হবেন;
৫. বেতন ছাড়া গৃহকর্মের কাজ কমিয়ে দেবেন এবং শক্তিক্ষয় না করে তা সঞ্চয় করবেন;
৬. গৃহস্থালির উন্নয়নের জন্য বাস্তবসম্মত উপায়ের পরিধি বাড়ানোয় কাজ করবেন এবং প্রাসঙ্গিক বিনোদনকে প্রাধান্য দেবেন।

এটি কেবল একটি মডেল। জায়গাভেদে এর রূপ পালটানো খুব স্বাভাবিক এবং এভাবে সবাই একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করে থাকলে একটি গোষ্ঠী নিজেরাই নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পারে। এ ক্ষেত্রে সবাইকেই যে একইরকম আবাসন প্রক্রিয়ায় থাকতে হবে তাও নয়। ব্যক্তিচিন্তাকে স্বাগত জানিয়ে একই কমিউনিটিতে এরকম নানা বৈচিত্র্যকে এক করে রাখা খুব সম্ভব।

স্থাপনা এবং নগর পরিকল্পনা সামাজিক পরিবর্তন করতে পারে না; কিন্তু বস্তুগত কাঠামো মানুষের দৈনন্দিন কাজকে নিশ্চয়ই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অলিঙ্গবাদী শহর পেতে হলে কমিউনিটি আর প্রাইভেট স্পেসের দ্বন্দ্ব বুঝে শুনে তার সমাধান করে এগোতে হবে নারী ও নারীবাদীদের। প্রখ্যাত লেখিকা ইসমত চুগতাই-এর চল্লিশ দশকের ছোটগল্প 'ঘরওয়ালী'র একটি সংলাপ দিয়ে এই লেখা খতম দেই আজ :

'মরদ তো ঘরের মেহমান, আসবে যাবে!'

কথাটা গল্পের প্রধান চরিত্র লাজ্জোর, যার জন্মের ঠিক নেই। ছোটকাল থেকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সাত ঘাটের জল খেয়ে বড়ো হয়েছে সে। কোথাও থিতু হতে দেয় নি তাকে কেউ। লজ্জা হায়া ছেড়ে শরীর দিয়ে হলেও বৃদ্ধ মির্জার ঘরের ভৃত্য হয়ে থেকেছে। কারণ একাকী বৃদ্ধ পুরুষের ঘরের গৃহকর্মী মানে তো সেই গৃহ বস্তুত তারই!

সুপ্রভা জুঁই স্থপতি। shuprava.jui.arch@gmail.com